। বড় বাঁধের লাভক্ষতি।

কল্যাণ রুদ্র

ভারতীয়দের চোখে নদী হল মা যার পলি ও জল এদেশের কৃষির মূল উপাদান। আপাতবিধ্বংসী বন্যাও এখানে বয়ে আনে সৃষ্টির বার্তা। ইংরেজ শাসকরা আসার আগে দুই বা তিন দিনের বন্যা কৃষিজমিতে নতুন পলি ফেলে নেমে গেলে কৃষকরা চাষ শুরু করতেন, কোন রাসায়নিক সার ছাড়াই প্রচুর ফলন হত। ব্রিটিশরা আসার পর এদেশে নদী-জল-পলির এই আন্তঃ সম্পর্কটি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল নদীর পাড় বরাবর বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা, তারপর উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল নদীতে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে সেচ ব্যবস্থার প্রসার। স্বাধীনতার পর শুরু হল বড় বাঁধ নির্মাণের নতুন যুগ। বড় বাঁধের লাভক্ষতি নিয়ে পৃথিবী জোড়া বিতর্কের অন্ত নেই। বহু যুগ ধরেই মানুষ চেষ্টা করেছে বর্ষার জল সংরক্ষণ করে শুখা মরসুমে সেচের জন্য ব্যবহার করতে। পরে সংরক্ষিত জল বিদ্যুৎ উৎপাদন, গৃহস্থালির চাহিদা মেটানো, মৎস্য চাষ ইত্যাদি কাজেও ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম পর্বে বাঁধ গুলি ছিল দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় ছোট, পরে বাঁধের আকার ও উচ্চতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। আমেরিকার হুভার বাঁধ আজও নির্মাণ-প্রকৌশলের বিস্ময়, বলা হয় ওই বিশাল বাঁধটি চাঁদ থেকে খালি চোখে দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীতে সারা পৃথিবী জুড়ে বহু বাঁধ নির্মিত হয়। ২০০৯ সালে নির্মিত চীনের থ্রি জর্জেস ড্যাম বর্তমানে পৃথিবীর বৃহত্তম জলাধার যা ৪০০০ কোটি ঘনমিটার জল ধারন করতে পারে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর চোখে বড় বাঁধ ছিল উন্নয়নের প্রতীক। তিনি ভেবে ছিলেন "বড় বাঁধগুলি হবে ভারতের উন্নতির দেবালয়"। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ, ১৯৬২ সালে চীনের সাথে এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের যুদ্ধের ধাক্কায় জাতীয় অর্থনীতি তখন বিপর্যস্ত। দেশজোড়া খাদ্য সংকট সামাল দিতে আমেরিকা থেকে জাহাজ বোঝাই করে গম আসছে কিন্তু সবার ক্ষুধা মিটছে না; সুতরাং উৎপাদন বাড়াতে হবে আর সেইজন্য চাই সেচ ব্যবস্থার প্রসার। স্বাধীনতার পরেই ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নয়নের ধারা মেনে শুরু হল নদী শাসনের এক নতুন যুগ। টেনিসি প্রকল্পের অনুসরনে তৈরী হল ডি ভি সি, এছাড়াও তৈরি হল ভাকড়া-নাঙ্গাল ও হিরাকুঁদ। দেশজুড়ে বহু নদীর বহমান ধারাকে বন্দী করে তৈরী হল চার হাজারের বেশি বড় বড় বাঁধ। প্রায় সবার অলক্ষে জলাধারের নীচে তলিয়ে গেল অন্তত চার কোটি মানুষের বাস্তুভিটে। এ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে জলাধারের নীচে যত জমি তলিয়ে গেছে তার মোট আয়তন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আয়তনের প্রায় সাত গুণ। ভারতে জলাধার নির্মানের জন্য যারা উদ্বাস্তু হয়েছেন তারা প্রায় সবাই আদিবাসী, বলা যায় তারা তথাকথিত উন্নয়নের বলি হলেন। ১৯৪৮ সালে উড়িষ্যার হিরাকুঁদ বাঁধের জন্য বাস্তুচ্যুত মানুষদের উদ্দেশ্যে নেহেরু বলেছিলেন —'আপনাদের দেশের স্বার্থে আত্মত্যাগ করতে হবে'। ১৯৪৮ সালে নেহেরুর পাশে দাঁড়িয়ে যে আদিবাসী রমনী ডি ভি সি জলাধারের উদ্বোধন করে ছিলেন তাঁর কথাও কেউ মনে রাখেনি। নেহেরুর সহকর্মী মোরারজী দেশাই —এর উক্তি আরও নির্মম। ১৯৬১ সালে হিমাচল প্রদেশের বিপাশা নদীর উপর, একটি বাঁধের নির্মাণকালে সম্ভাব্য বাস্তুচ্যুত মানুষদের বলেছিলেন —'জলাধারটি নির্মিত হলে আমরা আপনাদের ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলব। যদি আপনারা চলে যান তো ভাল, অন্যথায় আমরা জল ছেড়ে আপনাদের ডুবিয়ে দেব'। শুধু মানুষেরই ক্ষতি হয়েছে এমন নয়, জলাধারের নীচে তলিয়ে গেছে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, হারিয়ে গেছে জীববৈচিত্র। বাঁধ নির্মাণের পর একদিকে যেমন জলাধারে

ক্রমাগত পলি জমেছে, অন্যদিকে ভাটির দিকে নদীখাত ক্রমাগত শুকিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বাঁধ থেকে ছাড়া উদ্বৃত্ত জলে ভেসে গেছে গ্রামের পর গ্রাম। তবু এসব ঘটনা 'উন্নয়নের' রূপকারদের মনে কোনো দাগ কাটে নি। দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন লার্জ ড্যাম - এর পূর্বতন প্রেসিডেন্ট থিও ভ্যান রোব্রোইক বলেছিলেন — We need large dams and we are not going to apologize for it. Those in the developed countries, who already have everything put stumbling blocks in our way from the comfort of their electrically lit and air conditioned homes... The Third World is not ready to give up the construction of large dams, as much for water supply and flood control as for power.... Hydropower is the cheapest and cleanest source of energy, but environmentalists don't appreciate that. Certainly large dam projects create local resettlement problems, but this should be a matter of local not international concern.

কিন্তু রোব্রোইক -এর উক্তি প্রসঙ্গে অন্য কিছু কথাও বলা প্রয়োজন। প্রথমেই আসা যাক বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে। সব জলাধারের ধারন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সাধারণত জলাধারে তিনটি স্তরে জল রাখা হয়। নীচের স্তরটির নাম ডেড স্টোরেজ, যেখানে পলি জমে এবং এই জল ব্যবহার করা যায় না। মধ্যবর্তী স্তরটির নাম লাইভ স্টোরেজ— যেখানে সেচের জল সংরক্ষণ করা হয়। জলাধারের একেবারে উপরের স্তরে অতিবৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে ডি ভি সি কতৃপক্ষ জুলাই-আগষ্ট মাসে জলাধার পূর্ণ করে রাখে কারণ সেপ্টেম্বর মাসের বৃষ্টি অনিশ্চিত— হতে পারে বা নাও হতে পারে। হলে পূর্ণ জলাধার উদ্বৃত্ত জল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তখন জলাধার থেকে ছাড়া জল আর ভাঁটি এলাকার বৃষ্টির জল মিশে বড় বন্যা ডেকে আনে; যেমন ঘটেছিল ১৯৭৮ ও ২০০০ সালে। আরও একটি কথা হল একই জলাধারের জল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের কাজ করা যায় না। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জলাধার থেকে ক্রমাগত জল ছাড়তে হয় ফলে সেচের জন্য বর্ষার জল শুখা মরসুম পর্যন্ত জমিয়ে রাখা যায় না। বর্তমানে ডি ভি সি যে শক্তি উৎপাদন করে তার ৯৫ শতাংশ তাপ-বিদ্যুৎ।

জীবনের শেষ পর্বে বড় বাঁধ নিয়ে নেহেরুর মোহভঙ্গ হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সেচ ও শক্তি দপ্তরের বার্ষিক সভায় তিনি বলেছিলেন — আমরা এক লোক দেখানো বৃহদায়তন প্রকল্প নির্মাণের বিপদজ্জনক রোগে আক্রান্ত, আমাদের ফিরতে হবে ছোট ছোট প্রকল্পে আর সেই পথেই দেশের বৃহত্তর মঙ্গল। তাঁর সেই অনুধাবন উত্তরসূরীদের প্রভাবিত করেনি; তারপরও তৈরি হয়েছে অনেক বাঁধ। নানা প্রকল্পে টাকার যোগান দিয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক। আর এই বিপুল ঋণ সুদ সহ শোধ করছে দেশের ধনী-দরিদ্র সবাই।

একথা আজ সরকারি প্রতিবেদনেও স্বীকার করা হয়েছে যে বাস্তুতন্ত্রের অপূরণীয় ক্ষতি আর এত মানুষের চোখের জলে নির্মিত বড় বাঁধ গুলি আমাদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। জলাধারে সংরক্ষিত জলের বেশীর ভাগই বাষ্পীভূত হয়েছে বা খালের নীচের মাটি টেনে নিয়েছে; মাত্র ৩৮-৪০ শতাংশ জল সেচের কাজে লেগেছে। এই ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে মাটির নীচের জলভান্ডার থেকে আর সেচের জলের যোগান দিতে গিয়ে ভূগর্ভ-জলের ভান্ডার আজ অনেক স্থানেই রিক্ত।